NOV. 19 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা হয়রানির শিকার

আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী স্কুল ও কলেজ নিয়ন্ত্রণের এক গুরুদায়িত্ব শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হলেও রয়েছে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ও বিড়ম্বনার অভিযোগ। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য সূক্ষ্মভাবে ঢাকা পড়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট প্রদান পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব বর্তায় বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ওপর। আর সেই দায়িত্ববোধের (!) প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, ফরম ফিলাপ থেকে শুরু করে প্রবেশপত্র প্রদানসহ কার্যাদি গ্রহণ করা হয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর এই নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান দু'টোর সূক্ষ্ম ওপেন সিক্রেট যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থী, হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে অভিভাবক। বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত ফি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞান না থাকাও এর অন্যতম কারণ। বিশেষত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত ও টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের এই নিয়তির যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সর্বদাই। প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির দোহাই দিয়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি বিরোধী বা বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত শিক্ষার্থী দ্বারা পূরণে ব্যর্থ হলে তাদের ফরম ফিলাপের অযোগ্য (!) বলে প্রথমে যদিও ঘোষণা করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে হয় তো বা পার পেয়ে যেতেও পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন মোটা অংকের টাকা প্রতিষ্ঠানের হাতে ধরিয়ে দেয়া। তাছাড়াও নির্বাচনী পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্যতার রেষ ধরেও অনুরূপ বিষয় অনুযায়ী জরিমানা (!) প্রদান সাপেক্ষে তাকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপের গরমিল হিসাবটা। বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অতিরিক্ত এই টাকা হাতিয়ে নেয়ার অধিকারটুকু কতখানি বিধিভুক্ত? এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অভিনব পদ্ধতি হল এই শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধের (?) খ্যাতিরে নির্বাচনী এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার মধ্যকার সময়ে তাদের বিশেষ ব্যবস্থা (কোচিং) গ্রহণসাপেক্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চাবিকাঠি দিয়ে থাকে (?) যা দীর্ঘ ২ বছরে তাদের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্যই এই চাবিকাঠিই বলি আর মূলমন্ত্রই বলি না কেন, এর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হয় নির্ধারিত ফি।

এবার মোড় ঘোরানো যাক অন্যদিকে ফরম ফিলাপ বাবদ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি-এর অতিরিক্ত ফি আদায় সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য হল– পরীক্ষার সময় টিএনও, বোর্ড ও বিভিন্ন পরীক্ষা পরিদর্শনকারীদের খুশী করাতে পারলেই তো পরীক্ষার হলে একটি সুন্দর (!) পরিবেশ উপহার দেয়া যায়। যার মাধ্যমে এক ঘরোয়া পরিবেশে নিঃসংকোচে অসদুপায়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। এই পরিবেশ শিক্ষার্থী কর্তৃক আকাংক্ষিত না হলেও এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান সদা তৎপর। কিন্তু এই পরিবেশ তৈরীর জন্যও প্রয়োজন এক বৃহদাকার ফান্ড। কিন্তু সরকার কর্তৃক অনুদান মঞ্জুর না হওয়ায় নিরুপায় প্রতিষ্ঠান তাই তো পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে প্রবেশপত্র ফি বাবদ হাতিয়ে নিচ্ছে যথাসাধ্য অর্থ। অবশ্যই আমরা সুযোগের চাপে আছি বিধায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রে নির্বিকার। এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকাসম্পন্ন যদি কেউ দাঁড়ায়, তবে সে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠানের অমঙ্গলকামী। তবে প্রবেশপত্র ফি থেকে সার্টিফিকেট ফি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ফরম ফিলাপের সময় বোর্ড কর্তৃক ফি নিয়ে নেয়া হয় তবে কেন আবার মাথায় হাত? এই প্রবেশপত্র ফি বাবদ দিতে হবে স্বেচ্ছাচারীমূলক নির্ধারিত ফি। কিন্তু এসব তো হল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ তথা প্রাক-কালের কথা। কিন্তু যে সব বিষয়ে রয়েছে ব্যবহারিক পরীক্ষা, সেক্ষেত্রে এক্সটারনাল ও ইন্টারনালকে হাত করে নেয়াটা আমাদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এক দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু এ ব্যাপারটি নিয়ে লেখালেখি করতে হল– কারণ শিক্ষার্থীদের নম্বর বৃদ্ধির মাথাব্যথাটি যখন শিক্ষকের। এখানেও শিক্ষার্থীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। যাক কোনভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে একটি সনদের সুরাহা হলেই বেঁচে গেল শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় পাস করার পর শিক্ষার্থীর সনদ ও নম্বরপত্রের প্রয়োজন। কিন্তু এই সনদ প্রদানে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এক কৃতিত্ব (!!) কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ১৯৯৭ সালের এইচএসসি সনদ প্রদান এখনও হয়নি, সম্ভবত ২০০২ সালে প্রদান করা যেতে পারে বলে বোর্ডের বক্তব্য। পাঁচ বছরের মধ্যে সনদের ব্যবস্থার অপারগতায় শিক্ষার্থীদের প্রথমে গ্রহণ করতে হয় কলেজ/স্কুল প্রধানের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র। এর জন্য কোন নিয়ম-নীতি আদৌ বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত হয়েছে কিনা প্রশ্ন থেকে থাকে। নতুবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরপত্র ও প্রতিষ্ঠানের সনদ দেখিয়ে খালাসের জন্য ৩০০-৫০০ টাকা গ্রহণ করে নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা। অন্যদিকে বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই সনদ প্রাপ্তির জ্যাম থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী ফি প্রদানপূর্বক গ্রহণ করতে হয় সাময়িক সনদ। পরীক্ষায় পাসের পর সার্টিফিকেট পাওয়া মানবিক এবং সাংবিধানিক। কিন্তু বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহেলার অন্তরালে সাময়িক সনদ ফি বাবদ নেয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। মূল সনদ যেহেতু নিতে হয় এবং নেয়ার সাথে সাথে সাময়িক সনদ ফেরত নেয়া হয়। যেহেতু তখন সনদ ফি ফেরত দেয়া হয় না– কেন সনদের এই দীর্ঘসূত্রতার মধ্য দিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে শিক্ষার্থীকে? অন্যদিকে পরীক্ষার ফলাফলের পূর্বে সার্টিফিকেট/মার্কশীট বাবদ ফি গ্রহণ করার অর্থটা কি? অকৃতকার্যদেরও নম্বরপত্র ও সনদ প্রদান করা হয় নাকি? তবে সবচেয়ে মজার এবং দুঃখজনক ব্যাপার হল সনদ/নম্বরপত্রে কোনরূপ ভুল থাকলে এর জন্য পুনঃ ফি প্রদানপূর্বক ঠিক (শুদ্ধ) করে নিতে হয়। বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীকে। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে তাদের ইচ্ছাকৃত ভুলের ব্যাপারে বরাবরই অভিযোগ রয়েছে। আর একটি ব্যাপার হল ইংরেজী এবং বাংলায় সনদ উত্তোলনের। একই কাগজ কলম ব্যবহার করে একই রেজাল্ট। তবে কি ইংরেজীর ক্ষেত্রে লেখকের মজুরিটা বেশী না অন্য কিছু?

> **পরীক্ষায় পাস করার পর শিক্ষার্থীর সনদ ও নম্বরপত্রের প্রয়োজন। কিন্তু এই সনদ প্রদানে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এক কৃতিত্ব (!!) কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ১৯৯৭ সালের এইচএসসি সনদ প্রদান এখনও হয়নি, সম্ভবত ২০০২ সালে প্রদান করা যেতে পারে বলে বোর্ডের বক্তব্য। পাঁচ বছরের মধ্যে সনদের ব্যবস্থার অপারগতায় শিক্ষার্থীদের প্রথমে গ্রহণ করতে হয় কলেজ/স্কুল প্রধানের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র। এর জন্য কোন নিয়ম-নীতি আদৌ বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত হয়েছে কিনা প্রশ্ন থাকে।**

যাক নম্বরপত্র ও সনদের বিড়ম্বনা এড়াতে শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের যে শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও (এইচএসসি ও ডিগ্রী) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা। যাক সনদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা বোর্ডের মর্জি অনুযায়ী একদিন না একদিন সে তার মূল সনদ পাবে। কিন্তু এ সনদ গ্রহণ করতে হয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে। আর প্রতিষ্ঠান যেন ওৎ পেতে বসে আছে কোন দিন ঐ শিক্ষার্থী আসবে আর নিয়ে যাবে এই সার্টিফিকেট (সনদ)। কারণ যথাসম্ভব এই সনদ বিতরণ করার মহান (!) দায়িত্ব। আর এই সনদ নিয়ে গেলেই নাটকের সমাপ্তি। আর এই সমাপ্তিলগ্নেও পূরণ করতে হয় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা। দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি আর যাতায়াতের কনভেন্সটা বাদ দিলেও এক তিক্ত জঞ্জাল থেকে পরিত্রাণের সবশেষে প্রদান করতে হয় ১০০/২০০ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চাহিদা। তবে এই ফিসমূহ একজন সচল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যদিও প্রভাবহীন বা নিত্যনৈমিত্তিক, কিন্তু একজন দরিদ্র কৃষক অভিভাবক কি সক্ষম তার সন্তানের এত সব চাহিদা পূরণসাপেক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া। অসহায় ও নিরুপায় শিক্ষার্থী আর কতকাল এই দুর্নীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হবে? প্রশাসনের সুদৃষ্টির কি সময় আসে নাই? নাকি আমরা সবাই এই সকল সুতীক্ষ্ণ দুর্নীতিসমূহ জিইয়ে রাখতে ঐক্যবদ্ধ?

❑ আঞ্জিম মাহমুদ